।। উপসংহার ।।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না। কিন্তু "বাংলাদেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধানম্রচিত্তে স্মরণ করবেন।"[১] কারণ, তিনিই "বাংলা ইতিহাস-রচনার প্রথম প্রেরণাদাতা।"[২] এবং তিনিই "বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কোন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু ইতিহাস রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কালজয়ী সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন — "কোন দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল ? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে — কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র।"[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাবধান-বাণী থেকে আমরা ইতিহাস-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনার গভীরতাকে উপলব্ধি করতে পারি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার ভিত্তিতে তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-রচনায় অনুসরণযোগ্য প্রণালী সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারি।

"প্রত্যেক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখী হয়ে থাকে। সমাজরূপ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সেই লক্ষ্যানুযায়ীই পরিবর্তিত হয়।"[৫] ঐতিহাসিক যদি সে 'লক্ষ্য' সন্ধানে ব্যর্থ হন তবে জাতির ইতিহাস রচনাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা বাংলা-দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই 'লক্ষ্য' সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং 'দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম' করতে না পারায় ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে 'অনর্থক কালহরণ' করেছেন।

ইতিহাস রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ও নিরন্তর অধ্যবসায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন — "যাহা বলিতেছি

বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব।" [৬] 'বাঙ্গালার নব্য লেখক-দিগের প্রতি নিবেদন'-এ তাঁর উক্তি — "যে কথার প্রমাণ-দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।" [৭] "তিনি স্বয়ং (বঙ্কিমচন্দ্র) এ ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি কিছু বেশী পরিমানে প্রমাণ কণ্টকিত। কখনও কখনও সামন্য একটি তথ্যের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রচুরতম প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। যেখানে ঐতিহাসিক প্রমাণের নিতান্ত অভাব, সেখানে বাস্তব যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নিতে দেখা গেছে।" [৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে — "যাহা অসত্য .... বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য। .... তাহা একেবারে পরিহার্য্য।" [৯] অন্যত্র তিনি বলেছেন — "যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে।" [১০] প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এই বক্তব্যের যে অন্তর্নিহিত ভাব, তা থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী ছিলেন।

কেবলমাত্র নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ তথ্যসংগ্রহই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সেগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ঐতিহাসিকের অন্যতম প্রধান কাজ। ডঃ জীবেন্দ্র রায় বলেন — "..... ইতিহাসের ঘটনা-সর্বস্বতাকে মূল্যায়ণের সারাৎসার করা তাঁর (বঙ্কিম-চন্দ্রের) মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সব সময়েই কার্য পরম্পরা আবিষ্কারে যত্নবান।" [১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইতিহাসের আলোচনা পদ্ধতি হবে অস্পষ্টতাবর্জিত এবং বিস্তৃত। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের একটি সামগ্রিক এবং পূর্ণতর রূপ দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তিনি বলেছেন — "এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশ কতকাল শাসন করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখ।" [১২] একক প্রচেষ্টায় এই সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় বলে তিনি

সমষ্টিগত প্রচেষ্টার কথা বলেছেন — " আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য সে ততদূর করুক, ক্ষুদ্রকীট যোজন ব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয় সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" [১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কালক্রমানুসারে ইতিহাস রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি লিখেছেন — " সন্ তারিখশূন্য যে ইতিহাস' — সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য — প্রবেশের উপায় নাই ....।" [১৪] কালক্রমানুসারে ঘটনাবলীর পারম্পর্য রক্ষা করে ইতিহাস রচনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারনা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল এবং তাঁর এই সচেতনার পরিচয় আমরা পাই 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব' - এ। সেখানে তিনি লালমোহন বিদ্যানিধির (১৮৪৫–১৯১৬) 'সম্বন্ধ নির্ণয়' পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে পুস্তক-টির ১৬১ পৃষ্ঠায় সম্বতের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের হিসাবের একটি ভুল অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে নির্দেশ করেছেন। [১৫]

ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র Cross Examination প্রণালীর কথা বলেছেন। তাঁর মতে — " দেশীয় এবং বিপক্ষ দেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাস-বেত্তাদিগের সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ নির্ণীত হয় না।" [১৬] রবীন্দ্রনাথও বলেছেন — " .... ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্য–নির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক একভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্যভাবে সাক্ষী সাজাইবেন — তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।" [১৭] লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রও এই Cross Examination এর সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। যেমন, বল্লাল সেনের সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লাল সেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০৯১ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০৯১ শকাব্দ – ১০২৭ খ্রী: অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকদিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লাল সেন তাহার পূর্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রী: অব্দে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।" [১৮] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন — " .... এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার

চেষ্টা করি, বহু সত্যসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া যত্ন করি, তিনিও (বঙ্কিমচন্দ্রও) তেমনি করিয়া সেরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।" [১৯]

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রায়ই বাঙ্গার ইতিহাসের সঙ্গে ইউরোপের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাসের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এর ফলে " ইতিহাসজ্ঞান ও ইতিহাসপ্রীতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রস্তাবগুলির সরলতা ও আকর্ষণ বেড়েছে।" [20] বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা দুটি উদাহরণ দিতে পারি :-

(ক) " ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গুণ্ডী, আঁজুপ্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল।" [২১]

(খ) " সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই ? ইংরেজ নর্মানের অধীন হইয়াছিল, জার্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আটশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না।" [২২]

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নৃ-তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত নৃ-তত্ত্বের আলোচনা খুব বেশী প্রসার লাভ

করেনি। যদিও 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধটি রচনার সময় তিনি দুটি তত্ত্বই প্রয়োগ করেছিলেন, তবে ভাষাতত্ত্বের উপরই সমধিক গুরুত্ব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ।"[২৩]

ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যগুণ ও আবেগধর্মিতাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন — " .... মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর; — ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, ইহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ; ঐতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন ; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই - মহাভারতও হইতে পারে না।" [২৪] অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আবেগবহুলতা ও কাব্যগুণ লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ত্রুটি নয় বিশিষ্টতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতীয়তাবাদী চিন্তা। এ সম্পর্কে T.W.Clark বলেছেন — " .... the nationalism which Bankim's writings foreshadowed was a Hindu nationalism." [২৫]
তাঁর মতে — "Though he never explicitly said so, the implication of .... (the) terminological usage ('Hindu' as 'Indian') is clear : Muslims are not Indians, they are aliens." [২৬]

বঙ্কিমচন্দ্র 'তবকাতৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের লেখক মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এবং 'সিয়র-মুতক্ষরিণ' গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন এর সমালোচনা করতে গিয়ে উভয়ের সম্পর্কেই " গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমান " [২৭] বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধরনের মন্তব্য লক্ষ্য করেই T.W.Clerk বলেছেন —

"Bankim's references to Muslims are generally unfriendly, and in many places unmistakably hostile." [২৮]

এ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির কথা বলতে পারি। সেখানে আমরা দেখব যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে, হিন্দু - মুসলমান ভেদজ্ঞান করেন নি। রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখ তাঁর কাছে সমান সহানুভূতি পেয়েছে। এ ছাড়া 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ওসমান এবং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মীরকাসেম চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে মহৎচরিত্ররূপে অঙ্কিত। সীতারাম উপন্যাসের চাঁদ শাহ 'ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী'। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের প্রতি 'hostile' ছিলেন এমত গ্রহণ যোগ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মুসলমানদের দ্বেষক ছিলেন না, আমাদের এ মতের সমর্থনে, আমরা বিনা মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিবেদন উদ্ধৃত করছি — "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে — হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই — হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক — সেই নিকৃষ্ট।" [২৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস সাধনায় স্বদেশপ্রীতি ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চা পদ্ধতির মণিকাঞ্চন যোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্বদেশের 'গৌরবোজ্জ্বল' ইতিহাস উদ্ধার তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের মতে — "স্বজাতিহিতৈষী বঙ্কিম আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ধার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন .... বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরবোজ্জ্বল .... ইতিহাস।" [৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস-চর্চার বিষয়ে যতটা আগ্রহ ও সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে ততটা করেন নি। কিন্তু সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চিন্তাকে ছোট করে দেখা চলে না। কারণ, ভারতের অন্তর্গত কোন বিশেষ প্রদেশ নিয়ে যদি কেউ ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তাকে ভারত চিন্তার বিরোধী বলা যায় না। তবে সামগ্রিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে চিন্তা করেছেন ; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধ।

বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলার ইতিহাস রচনায় তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়কে যেমন সাফল্যজনক ভাবে প্রবৃত্ত করাতে পেরেছেন তেমনি বাংলার আধুনিক ইতিহাস লেখকদেরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর ইতিহাস চিন্তার মধ্যে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' সংকীর্ণতা হয়ত কিছু ছিল, হয়ত তাঁর ইতিহাস চর্চার সাফল্যও ছিল সীমিত ; কিন্তু, তবু সে প্রচেষ্টা ও সাফল্যকে আমরা অবহেলা করতে পারি না।

বাংলার ইতিহাস সাধনা সম্পর্কে একদা বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপোক্তি ছিল যে, — "যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। .... কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি — এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।" [৩১] "মৃত্যুর (১৮৯৪) অল্পকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি। কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনার জন্যে তিনি যে পথ প্রদর্শন ও প্রেরণাদান করে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই সে পথে সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেনাপতিদের আগমনবার্তা শোনা যেতে লাগল।" [৩২]

আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গেতিহাস চর্চা ও চেতনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র মিত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পুরাতত্ত্ববেত্তাবৃন্দ আবির্ভূত হয়ে বাংলার ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রটি নক্ষত্র-খচিত করে তুললেন। আধুনিক কালে যোগেশ চন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ প্রমুখের গ্রন্থপাঠ করে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে আদর্শের অনুপ্রেরণা আজও বিনষ্ট হয়নি। পিতা যেমন পুত্রের মাঝে, গুরু যেমন শিষ্যের মাঝে অমর ; বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনাও তেমনি তাঁর উত্তরসাধকদের মাঝে ভাস্বর। সে চেতনার বলেই আমাদের অতীত গৌরব উদ্ধার পেয়েছে, বর্তমান গৌরব রক্ষিত হচ্ছে এবং ভাবী গৌরব সমৃদ্ধি পাবে।